সমকাল

19 APR 2016

# গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার মান বাড়াতে

শিক্ষা | ড. ছিদ্দিকুর রহমান

অধ্যাপক (অব.) ও প্রাক্তন পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়ন লক্ষণীয়। শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে যে গতিতে ও যে পরিসরে উন্নয়ন হয়েছে এবং হচ্ছে, তার তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের গতি কিছুটা মন্থর। অন্যান্য শাখার তুলনায় আনুপাতিক হারে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০০ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষার্থী ছিল ৩০ শতাংশের কাছাকাছি, ২০১৬ সালে এ হার কমে দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশে। আজকের আলোচনায় বিজ্ঞান শিক্ষার তিনটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হলো– বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো; প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষার দুর্বল দিকগুলো এবং অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই শুধু নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্বলতাগুলো দূরীকরণ এবং বিজ্ঞান শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার উপায়।

**বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো :** জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে যুগান্তকারী কিছু কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসবের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে : ক. হাতে-কলমে সমন্বিত পদ্ধতিকে বিজ্ঞান শিক্ষা; খ. প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানমূলক কাজ করবে; গ. বর্তমানে প্রচলিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মতো আলাদা 'প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা' থাকবে না, অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল থাকবে, এর অর্জন যাচাই হবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়; ঘ. হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বা প্র্যাকটিক্যাল শুধু উপরের শ্রেণীতে নয়, ষষ্ঠ থেকে পরবর্তী সব শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য এবং ঙ. বিজ্ঞান শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতির ব্যবহার করা, এ পদ্ধতিতে যুক্তিসিদ্ধভাবে সত্যে পৌঁছাতে হয়। যেমন– পানিতে অদ্রবণীয় কোনো কঠিন বস্তুর ওজন পানিতে ডুবিয়ে নিলে এবং পানিতে না ডুবিয়ে নিলে কোনো পার্থক্য হয় কি-না তা যাচাই করা। সত্যটা আগেই বলে দিয়ে তা যাচাই অবরোহী পদ্ধতি। আর পরীক্ষা করে সত্য বের করা হলো আরোহী পদ্ধতি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ বিজ্ঞান শিক্ষার উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকার সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম কার্যক্রমের অধীনে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে দেশের ৬০ হাজার বিজ্ঞান শিক্ষকের নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ বিষয়ে ৩০ হাজার প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০ হাজার বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতি-উপকরণাদি সরবরাহ করার প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে দেশের প্রায় সবক'টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ চালু করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম থেকে সুফল পেতে হলে এবং কার্যক্রমগুলো টেকসই করতে হলে অত্যাবশ্যকীয় করণীয় হচ্ছে– ক. স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের কার্যক্রম 'মেনটরিং' এবং 'মনিটরিং'-এর ব্যবস্থা চালু করা; খ. প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের (প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ) জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাসহ সার্বিক বিষয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ. গণমাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং জনগণকে এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করা, যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়।

**বিজ্ঞান শিক্ষার কয়েকটি দুর্বল দিক :** বহুদিন ধরে চলা পুঞ্জীভূত অনেক সমস্যারই সমাধানের চেষ্টা চলছে। এসব সমস্যার মধ্যে একটি খুবই গুরুতর এবং এর বিরূপ প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বিষয়টি হলো বর্তমানে প্রচলিত ব্যবহারিক পাবলিক পরীক্ষা। অর্থাৎ এসএসসি এবং এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষা। একজন শিশু বা কিশোর যখন পরীক্ষার নামে টাকা দিয়ে নম্বর কেনে, তখন সে কী নৈতিকতা শেখে? দু'চারটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া সর্বক্ষেত্রেই প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা দিয়ে ২৫-এ ২৪ বা ২৫ নম্বরই পাওয়া যায়। টাকা না দিলে ১০ বা ১২ নম্বর, দিলে সবটা। না দিলে A+ ছুটে যাবে। তাই অভিভাবক বাধ্য হয়ে দিচ্ছেন। এটা আজ এমন গোপন কথা যা সবাই জানে। এটা আজকের সৃষ্টি নয়, গত তিন যুগের বেশি সময় ধরে বাড়তে বাড়তে আজকের পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে প্র্যাকটিক্যাল তুলে দেওয়া যাবে না; কিন্তু এ অনৈতিক শিক্ষার অবসান অনতিবিলম্বে ঘটাতেই হবে। প্রচলিত ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রথা চলার ফলে শিক্ষার নামে এমন ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি হচ্ছে, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবৈধ পথে চলাকে অন্যায় মনে করে না। এজন্য শিক্ষার্থীদের দায়ী করা চলবে না। আমরা যারা নীতিনির্ধারণ থেকে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার পর্যায়ে আছি আমরাই এ অপরাধে অপরাধী।

**সমস্যা সমাধানের উপায় :** সমাধানে অর্থের প্রয়োজন হবে না, নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক শক্ত অঙ্গীকারের মাধ্যমে এ সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুসারে সমন্বিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রম একই সঙ্গে পরিচালিত হবে। বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক নবম-দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে দশবার ব্যবহারিক বিজ্ঞান পরীক্ষা নেবেন (তাত্ত্বিক অংশেরও নেবেন)। ব্যবহারিকে পূর্ণমান ২৫ ধরে প্রতি শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করে, ওই গড় নম্বরই ওই বিষয়ে শিক্ষার্থীর ব্যবহারিকে প্রাপ্ত হবে। এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণপূর্বক ফরম বোর্ডে জমা দেওয়ার সময় বিজ্ঞান শাখার প্রতি শিক্ষার্থীর প্রতি বিষয়ে ব্যবহারিক অংশে প্রাপ্ত নম্বরও বোর্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। টেবুলেশন সিটে ব্যবহারিকে প্রাপ্ত নম্বর পরীক্ষা শুরু হওয়ার অনেক আগেই রেকর্ড করে রাখা হবে। পাবলিক পরীক্ষা হওয়ার পর বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক অংশে প্রাপ্ত নম্বর টেবুলেশন করা হবে। তখন বিশেষভাবে তৈরি Software-এর মাধ্যমে প্রতি শিক্ষার্থীর বিজ্ঞানের প্রতি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার বের করা হবে। দুই অংশে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে যদি শতকরা ২০ (বা নির্ধারিত অন্য কোনো হার)-এর বেশি পার্থক্য থাকে, সে ক্ষেত্রে ওই শিক্ষার্থীর ওই বিষয়ের ব্যবহারিক অংশে শিক্ষক-প্রদত্ত নম্বর বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে ওই শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক অংশে প্রাপ্ত নম্বরের হারে ব্যবহারিক নম্বর দেওয়া হবে। এ প্রথা চালু করা হলে শিক্ষক যখন বুঝবেন অপাত্রে বেশি নম্বর দিলে তা গৃহীত হয় না, তখন প্রাপ্য বা যথার্থ নম্বর দেবেন। কোনো শিক্ষকের দেওয়া নম্বর যদি ৫০ শতাংশ বা এর অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পরপর দু'বছর বাতিল হয়, তখন ওই শিক্ষককে জবাবদিহির আওতায় এনে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষা বোর্ডের কোনো কোনো উচ্চপদধারী কর্মকর্তার উল্লিখিত সমাধানের সঙ্গে একমত না হওয়ারই কথা। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সবক'টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার তিন বছরের বিজ্ঞান বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের ফল বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে যে, প্রায় সবক'টি বিষয়ে তাত্ত্বিক অংশে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ৬০ শতাংশ এবং ব্যবহারিক অংশে ঐ গড় সব বিষয়ে ৯৭ শতাংশের ঊর্ধ্বে।

প্রশ্ন করতে পারেন, ফল প্রকাশে সময় বেশি লাগবে। মোটেই না। যাদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা সীমিত তারাই এ কথা বলবেন। যাদের ধারণা আছে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হলে নির্ধারিত সময়ে এটি তারা অবশ্যই করে দেখাতে পারবেন।

স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর অন্য একটি বড় অন্তরায় হচ্ছে– বিজ্ঞান শিক্ষক স্বল্পতা। বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষকই ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে গণিত ও বিজ্ঞান পড়াবার কথা। বিজ্ঞান শাখা নেই, এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে বিজ্ঞানের ক্লাস সংখ্যা ২০টি এবং গণিতের ২০টি, সর্বমোট ৪০টি। একটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে ৫০ মিনিটের ৩৪টি ক্লাস হওয়ার কথা। একজন বিজ্ঞান শিক্ষক যদি দৈনিক ৬ পিরিয়ড করে সপ্তাহে ৩৪টি পিরিয়ডও ক্লাস নেন, তা হলেও ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব ক্লাসে তার পক্ষে গণিত ও বিজ্ঞানের সবক'টি ক্লাস নেওয়া সম্ভব নয়। এটা কী করে ভাবা যায় যে, দৈনিক ৬ পিরিয়ডের মধ্যে একটানা ছয় পিরিয়ড ক্লাস নেবেন। তাও আবার প্রতিটি ৫০ মিনিটের গণিত ও বিজ্ঞানের ক্লাস। কোনো অবস্থাতেই একজন শিক্ষককে গণিত ও বিজ্ঞানের মতো বিষয় দৈনিক ৪ পিরিয়ডের বেশি দেওয়া ঠিক নয়। তা মানসম্মত শিক্ষার অন্তরায়। এবার দেখা যাক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা আছে এমন সব স্কুলের অবস্থা। ওইসব স্কুলে বিজ্ঞান ও গণিতের সাপ্তাহিক ৪০ পিরিয়ডের অতিরিক্ত উচ্চতর গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান নবম ও দশম শ্রেণীতে সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা ২৪টি। সব মিলিয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর গণিত ও সবক'টি বিজ্ঞান বিষয়ের মোট পিরিয়ড সংখ্যা ৬৪টি। উল্লিখিত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিজ্ঞান শাখা নেই এমন প্রতিটি বিদ্যালয়ে গণিতসহ বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিধারী কমপক্ষে দু'জন এবং যেসব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা আছে এমন প্রতিটি বিদ্যালয়ে গণিতসহ বিজ্ঞানে স্নাতক দু'জন এবং জীববিজ্ঞানসহ স্নাতক একজন সর্বমোট তিনজন বিজ্ঞান শিক্ষক আবশ্যক। বর্তমান জনবল কাঠামো অনুসারে উল্লিখিত দু'ধরনের বিদ্যালয়ে অনুমোদিত বিজ্ঞান শিক্ষকের পদ যথাক্রমে একটি ও দুটি। প্রয়োজনীয় ডিগ্রিধারী বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাবে অনেক স্কুলেই অন্য বিষয়ে ডিগ্রিধারী শিক্ষক কর্তৃক গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা না বুঝে মুখস্থ করতে বাধ্য হয়। গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য জনবল কাঠামো পরিমার্জন করে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক।

কেউ যদি মনে করেন, উল্লিখিত পদ্ধতি সুফল বয়ে আনবে না, তাদের প্রতি অনুরোধ, বিকল্প কার্যকরী পদ্ধতি তুলে ধরুন। টাকার বিনিময়ে নম্বর কেনা পদ্ধতি চালু রেখে জাতির ভবিষ্যৎকে নষ্ট করার অধিকার আমাদের কারও নেই। শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যান, সচিব বা প্রশাসনিক পদে যোগ্য ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক থাকতে পারেন; কিন্তু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং এ দপ্তরের সবার 'Assessment and Evaluation' বিষয়ে পাণ্ডিত্য থাকা অত্যাবশ্যক। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে স্নাতকোত্তর এমনকি পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হয়। তাছাড়া উন্নত বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞও আমাদের দেশে আছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মতো বিশেষায়িত পদে ওইসব বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া অত্যাবশ্যক। কোনো ব্যবস্থা থেকে প্রত্যাশিত ফল পেতে হলে 'Place right person in right place' নীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

semzs@yahoo.com

স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর অন্য একটি বড় অন্তরায় হচ্ছে– বিজ্ঞান শিক্ষক স্বল্পতা। বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষকই ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে গণিত ও বিজ্ঞান পড়াবার কথা। বিজ্ঞান শাখা নেই, এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে বিজ্ঞানের ক্লাস সংখ্যা ২০টি এবং গণিতের ২০টি, সর্বমোট ৪০টি। একটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে ৫০ মিনিটের ৩৪টি ক্লাস হওয়ার কথা। একজন বিজ্ঞান শিক্ষক যদি দৈনিক ৬ পিরিয়ড করে সপ্তাহে ৩৪টি পিরিয়ডও ক্লাস নেন, তা হলেও ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব ক্লাসে তার পক্ষে গণিত ও বিজ্ঞানের সবক'টি ক্লাস নেওয়া সম্ভব নয়